আল কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না!

পর্ব-১

আরব জায়নবাদী ফয়সাল থেকে বিন যায়েদ

সফর ১৪৪৩ - সেপ্টেম্বর ২০২১

আল কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না! পর্ব-১

আরব জায়নবাদী

ফয়সাল থেকে বিন যায়েদ

(আরবে ইহুদীবাদের প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকার ইতিবৃত্ত)

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

القدس لن تهود (الجزء الأول) : صهاينة العرب : من فيصل لابن زايد – للشيخ أيمن الظواهري– حفظه الله –

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ১:০১:৩৬ সেকেন্ড

প্রকাশের তারিখ: সফর ১৪৪৩ – সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, মানবতার মুক্তির দূত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীদের উপর।

পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি সালাম:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আমি আপনাদের নিকট ঐ গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, যা আরবে ইহুদীদের নিকৃষ্টতম এজেন্ট মুহাম্মাদ বিন যায়েদের নেতৃত্বে বিকশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ বিন যায়েদই সেই ব্যক্তি যার হাত ধরে আরব ভূ-খণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে ইহুদী প্রকল্পগুলো দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে।

আমি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে, একদল বীর মুজাহিদের শাহাদাত বরণের সুসংবাদের মাধ্যমে উম্মাহকে সান্ত্বনা দিতে চাই। আল্লাহ তাঁদের সকলের রুহের উপর রহমত নাযিল করুন। তাঁদের দান করুন জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম। আর আমাদরকেও তাঁদের সঙ্গী হবার তাওফিক দান করুন। আমীন।

শহীদদের এই কাফেলায় শামিল ভাইরা হলেন–মুহাম্মাদ সাইদ আশ-শিমরানী, আবু হুরায়রা আস-সানআনি, হিশাম ইশমাউই, শাইখ আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ, আবু কাসসাম আল উরদুনি এবং আবু মুহাম্মাদ আস সুদানি। আল্লাহ তাঁদের সকলের রুহের উপর রহমত নাযিল করুন।

দ্বীন, উম্মাহর গৌরব এবং পবিত্রতা রক্ষায় এই ভাইরা ক্রুসেডার ও তাদের পদলেহনকারীদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়ে গেছেন। তাঁরা এমন আদর্শ রেখে গেছেন, যা সকলের জন্য অনুকরণীয়। তাঁরা তাদের আদর্শকে জিহাদ, কুরবানী এবং আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেখে গেছেন।

মুহাম্মাদ সাঈদ আশ-শিমরানীর (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) চিন্তাভাবনাই ছিল শুধু এই উম্মাহকে নিয়ে। তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাতিমে রাসূলের হত্যার পন্থাকে। তিনি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ক্রুসেডার বাহিনী ও যুগের হুবালদের শক্তিশালী নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিন্ন করে হামলা চালিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক অবিচল নেতা ও অকুতোভয় বীর সিংহ - আবু হুরায়রা আস সানআনি'র উপর। সাফাভিদের উত্তরসূরি হুথি সন্ত্রাসী, ক্রুসেডার আমেরিকা এবং তার উচ্ছিষ্টভোগী সৌদি ও আমিরাতি বাহিনীর সাথে অসম এক যুদ্ধে তিনি নিজের অনুসারী মুজাহিদ ভাইদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শত্রুর প্রবল হামলায় না শঙ্কিত হয়েছেন, না হাল ছেড়ে পিছু হটেছেন। বরং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি কালিমার ঝাণ্ডা বুলন্দ করে রেখেছিলেন। এরপর পান করেছেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। কালিমার এই ঝাণ্ডাকে রক্তে রঞ্জিত করে, একে বহনের মহান দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি মুজাহিদ ভাইদের।

উম্মতে মুসলিমাকে আমি সান্ত্বনা দিতে চাই আরও এক বীরের বীরত্বগাথা শুনানোর মাধ্যমে। আর তিনি হলেন সদা ধৈর্যশীল বীর মুজাহিদ হিশাম আল ইশমাউই, আল্লাহ তাঁর রুহের উপর রহমত নাযিল করুন। হিশাম ইশমাউই এর বীরত্বগাথা বলতে গেলে, তাঁর সাথীভাই – ইমাদ আব্দুল হামীদ এবং উমর রিফাই আস-সুরুর এর ব্যাপারেও বলতে হবে। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রহম করুন। মিশরের বিপদসংকুল ময়দানে, আলোর দিশারি এই আত্মোৎসর্গকারীরা সদা অবিচল থেকেছেন। তাঁরা উম্মতকে জানিয়ে দিলেন - মিশরের ভূমি এখনো এমন এক প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম - যারা দাওয়াহ, জিহাদ এবং নিজেকে বিলিয়ে দেবার ময়দানে সদা তৎপর।

আমি উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আফ্রিকার ইসলামিক মাগরিবের আমার ভাই, প্রখ্যাত শাইখ, বীর মুহাজির মুজাহিদ এবং প্রজ্ঞাবান আমীর আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদের কথা। পুরো অঞ্চলের জিহাদের ময়দানে যিনি ছিলেন অটল, অবিচল এক ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁর ও তাঁর সঙ্গী ভাই আবদুল হামীদ, আবু আবদুল কারীম এবং আনাস এর উপর খাস রহমত নাযিল করুন।

এই উম্মাহর জন্য তাঁর অবদান অনেক। জিহাদের ময়দানে তিনি দিয়েছেন কঠিনতম পরীক্ষা। আমি তাঁর জন্য দুয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁকে তাঁর কাজের সর্বোত্তম জাযা দান করেন। চলমান এই ক্রুসেড যুদ্ধের মোকাবেলায় শাইখ আবু মুসআব মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে পরিণত করেছেন কাতারবদ্ধ এক সীসাঢালা প্রাচীরে। শাইখ আবু মুসআব ছিলেন অনেক দানশীল এবং আত্মত্যাগী। তাঁর জীবনী সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং এর যথাযথ অনুকরণ আমাদের সকলের কর্তব্য। আল্লাহর কাছে আমার দুয়া, তিনি যেন জান্নাতে শাইখের সাথে আমাদের সকলকে থাকার সুযোগ করে দেন, তার উপর রহম করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে, জিহাদের ময়দানে শাইখের দক্ষতা ও প্রাধান্য এবং দানশীলতার ময়দানে তাঁর সুপ্রসারিত হাত সম্পর্কে উম্মাহর সামনে তুলে ধরার সুযোগ দান করুন।

মুহাজির ভাই আবু কাসসাম আল উরদুনি , আল্লাহ তাঁর ও তাঁর সাথী শাইখ বেলাল আস-সানআনী'র উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি ছিলেন একজন মুহাজির মুজাহিদ - যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজের সবটুকু কোরবানি করতে কখনোই দ্বিধাবোধ করেননি। জিহাদের ময়দানে তিনি আপন দক্ষতা ও নৈপুণ্য দিয়ে ক্রমেই উন্নতি লাভ করেছেন। এক পর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁকে পদোন্নতি দিয়েছেন, আবু কাসসামকে তিনি দান করেছেন শাহাদাতের ঈর্ষণীয় মর্যাদা। আল্লাহর কাছে আমার দুয়া, তিনি যেন ভাইয়ের শাহাদাতকে কবুল করে নেন এবং সিরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় ভাইয়ের রাখা অবদানের পূর্ণ প্রতিদান দেন।

পরিশেষে, আমি আল্লাহর নিকট দুয়া করি তিনি যেন আমাদের ভাই, শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস সুদানীর শাহাদাত কবুল করেন এবং পূর্ব আফ্রিকা ও সিরিয়ায় তার জিহাদ ও হিজরতকে কেয়ামতের দিন নেকের পাল্লায় রাখেন। আরও দুয়া করি আল্লাহ যেন জান্নাতে আমাদের সকলকে শাইখ এর সাথে থাকার সুযোগ করে দেন, আমীন।

কিছু দরদভরা পঙক্তি

আমরা এমন জাতি, যাদের নিকট হত্যা ও লড়াই কোন লজ্জাজনক বিষয় নয়।

বিপরীতে আমের ও সালুন গোত্রের নিকট হত্যা ও লড়াই লজ্জাজনক বিষয়।

মৃত্যুর প্রতি ভালোবাসা মৃত্যুকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেয়।

আর মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা তাদেরকে মৃত্যু থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

আমাদের কোন নেতা প্রতিশোধ বিহীন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন না।

বরং প্রত্যেকেই লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুর হাতে শহিদী মৃত্যুবরণ করেন।

তরবারি আমাদের একমাত্র হাতিয়ার।

তরবারি ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলি না।

আর যখন আমাদের কোনো নেতা অন্য কোনো নেতার সাথে সাক্ষাৎ করে

তখন তার সাথে সম্ভ্রান্ত লোকদের মতো আচরণ করে।

শত্রুদের সাথে আমাদের লড়াইয়ের দিনগুলো তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কেননা সেই দিনগুলো তাদের জন্য লজ্জা, লাঞ্ছনার সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিলো।

পূর্ব-পশ্চিমে যেখানেই যাই আমরা অস্ত্র ত্যাগ করি না।

কেননা এই অস্ত্র দিয়েই আমরা পরাশক্তির মোকাবেলা করি।

মুসলিম উম্মাহকে শুরুতেই বলে রাখি; বাইতুল মাকদিস ইহুদীদের হাত থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়েই যাবো। আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিমভূমিগুলো পুনরুদ্ধারে আমরা জিহাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাব। এই বরকতময় আক্রমণে শত্রুদের সামনে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করার কারণে আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মুজাহিদ ভাইদেরকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহর সাহায্যে এসকল অঞ্চলের ইসরাইলের পা চাটা গোলামরা মুজাহিদ ভাইদের দ্বারা শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে ইনশাআল্লাহ।

শাইখ আবু উবাইদা আহমদ ওমর হাফিযাহুল্লাহঃ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক ইমামুল মুত্তাক্বীন, সাইয়েদুল মুজাহিদীন, হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, সালফে সালেহীন এবং প্রত্যেক যুগে যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিবেদিত করে মরণপণ লড়াই করেছেন তাদের সকলের উপর।

হামদ ও সালাতের পর:

প্রিয় উপস্থিতি! আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হওয়ার মুহূর্তে বিদায় জানাতে পেরে আমি আজ খুবই উৎফুল্ল। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মতো বড় নেয়ামতসহ যেসকল নেয়ামত দিয়েছেন, সে সকল নেয়ামতের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ইসলামের নেয়ামতের পর আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছেন। কত লোক এমন আছে, যারা গতানুগতিক ধারায় ইলম শিখছে এবং সব সময় জিহাদের অধ্যায় পড়ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেরা জিহাদের ময়দানে এসে কিছু সময় ব্যয় করার তাওফিক তাদের হয়নি। সুতরাং কোন কাফেলার হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করা - এক মহান নেয়ামত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, সব সময় তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য-অগণিত। আমারা সারা জীবন আল্লাহর এই নেয়ামত ভোগ করছি।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

“অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতরাজি গুনতে শুরু করো তাহলে গণনা করে শেষ করতে পারবে না”। (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৪)

শাইখ আইমান আয যাওয়াহীরি হাফিযাহুল্লাহঃ

হে মুসলিম উম্মাহ!

আপনারা এই বরকতময় হামলায় শরীক হোন এবং দখলদার ইহুদীদের দ্বারা অবরুদ্ধ বাইতুল মাকদিস রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসুন।

আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুজাহিদ ভাইয়েরা - আপনারা আল্লাহর দুইজন বান্দির মুসলিম হওয়ার মাধ্যম হয়েছেন, তাই আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের মাধ্যমে তাদের দুজনের ইসলাম গ্রহণকে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান দু'টি বিজয় মনে করছি। এ বিজয় ইসলামের দিকে দাওয়াতের ময়দানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ সকল মুজাহিদ ভাই ও মুসলমানদের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো - মানবজাতির হেদায়েত এবং তাদেরকে কুফরের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসা। তাদের উক্ত কাজ নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল স্বরূপ হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿﴾وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿﴾

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে"। (সূরা আহযাব ৩৩ : ৪৫-৪৬)

ইটালিয়ান ও ফরাসী দুই বন্দী বোনকে এই মুজাহিদদের মাধ্যমে ইসলামে ধাবিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। মানব জাতির হেদায়াতের মেহনতের কারণে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ইতিপূর্বেও আমেরিকান ও ইতালিয়ান দুই বন্দী ভাইয়ের হেদায়েতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উপমহাদেশের কায়েদাতুল জিহাদের ভাইদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তারা বন্দী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমেরিকান সরকার তাদের অবস্থানস্থলে বোমা হামলা করে তাদেরকে হত্যা করে। অতঃপর ওবামা প্রশাসন নিজেদের পবিত্রতা জাহির করতে গিয়ে আফসোস প্রকাশ করে বলেছিল যে, উক্ত হামলাটি ভুল ছিলো।

শাইখ খুবাইব সুদানী রহিমাহুল্লাহ

বহু বছর ধরে ফিলিস্তিন ইস্যু মুসলিম উম্মাহর প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটিই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর প্রধান ও কেন্দ্রীয় বিষয়। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের

অন্তরে ফিলিস্তিনের একটি বড় অবস্থান রয়েছে। কারণ এ ভূমি - নবীগণের ভূমি, রিসালাত তথা ওহীর অবতরণস্থল, মুসলমানদের প্রথম কেবলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজের রাতের অবস্থানস্থল।

অনুতাপের বিষয় হচ্ছে, এই ভূমি পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও একশ বছরের বেশী সময় ধরে তা কিছু বানর ও শুকরের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এটা অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের একটি স্বীকৃত বিষয়। বহু আগ থেকে ইহুদী জাতি প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের অধিকার লুণ্ঠনসহ নানান বিভীষিকাময় অপরাধ করে যাচ্ছে। জায়নবাদী ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদের আযাদী তথা স্বাধীনতার লক্ষ্যে জিহাদের আহবানকারী সংগঠন ও আন্দোলনগুলোকে বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। এর ফলে 'ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন' এবং 'বামপন্থী' ধারা - জিহাদী আন্দোলনসমূহের স্থান দখল করে নিয়েছে। ফিলিস্তিন স্বাধীনতার লক্ষ্যে এসকল শয়তানের সাথে মৈত্রীস্থাপনের শ্লোগানের আড়ালে ঐ বামপন্থী আন্দোলনে অনেক ভ্রান্ত আকিদা ও নানা কুফুরি কাজের মিশ্রণ ঘটেছে। যার ফলে ফিলিস্তিনিরা এখনো আযাদী বা স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

আমার মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইগণ!

নিশ্চয় ফিলিস্তিনিদেরকে অনেক ব্যবসায়ী বারবার বিক্রি করেছে।

'আশ শরিফ হুসাইন' যখন উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ করে, তখন কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ফিলিস্তিনকে তার কর্তৃত্ব থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং 'বেলফোর চুক্তি'র ভিত্তিতে ইহুদীদের হাতে সোপর্দ করে দেয়।

উপস্থাপকঃ

"যখন সাইকস-পিকট চুক্তির রহস্য উন্মোচিত হয় ও "বেলফোর ঘোষণা" আশ শরিফ হুসেইনের হাতে আসে, তখন সে হতবাক হয়ে যায়। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার তাকে আশ্বস্ত করার জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই

প্রতিনিধি ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কায়রো অফিসের কমান্ডার হোগার্ট (Commander Hogart)। সে আশ শরীফ হুসেনের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাত করে এবং ঐ সাক্ষাৎকারের উপর একটি প্রতিবেদন লিখে কেন্দ্রে পাঠায়।

এই রিপোর্টে হোগার্ট সাইকস-পিকট চুক্তির বিষয়ে শরীফ হুসেইন এর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলে, "শরীফ হুসেইন তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মূল সাইকস-পিকট পরিকল্পনায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেটা সে মেনে নিবে"।

বেলফোর ঘোষণাপত্রের বিষয়ে হুসেইনের অবস্থান বিষয়ে হোগার্ট লিখেছিল: "আশ শরীফ হুসেনের প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত করে যে, তিনি বেলফোর ঘোষণা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।" এতে সে আরও যুক্ত করে যে, "আশ শরীফ হুসেইন উৎসাহের সাথে একমত হয়ে বলেন, "তিনি সব আরব দেশে ইহুদীদের স্বাগত জানান।"

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এমনকি তিনি তার সরকারী কর্মকর্তাদের 'আরব বিদ্রোহ' শান্ত করতে বলেছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল - ইংরেজদের প্রতি তার আন্তরিকতা প্রদর্শন করা।

উপস্থাপকঃ

"পরবর্তী মাসগুলোতে আশ শরীফ হুসেইন তার আন্তরিকতার অনেক প্রমাণ দিয়েছে। মিশরে তার জ্যেষ্ঠ অনুসারীদের এবং বিপ্লবী বাহিনীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের বলেছে যে, তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে এই মর্মে আশ্বাস পেয়েছে যে - ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসতি আরবদের স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করবে না। এমনকি হুসেইন তাদেরকে গ্রেট ব্রিটেনের চুক্তিসমূহের প্রতি আস্থা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন।

শরীফ হুসেইন তার সন্তানদের ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে - 'বেলফোর ঘোষণা' দ্বারা যে ভয় সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার আদেশ দেন। একই নির্দেশাবলীসহ 'আকাবা'তে 'ফয়সাল' এর কাছে একজন বার্তাবাহক

প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে তার সরকারী গেজেটে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ফিলিস্তিনের আরব জাতিদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'আরবদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও আচাররীতি – অন্যের প্রতি সমাদর ও সহানুভূতিরই নির্দেশ দেয়'। এর দ্বারা শরীফ হুসেইন কার্যত ইহুদীদের মেনে নেয়ার আহবান জানায়। এর পাশাপাশি হুসেইন আরব ফিলিস্তিনিদের উদ্বুদ্ধ করেন, "যাতে তারা ইহুদীদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে এবং কল্যাণকর পথে তাদের সহায়তা করে"।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

তার ছেলে ফয়সাল বিন আল-হুসেইন ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে, জায়নবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি হাইম ওয়েইজম্যানের (Haeim Weizman) সাথে 'ফয়সাল-ওয়েইজমান চুক্তি (Faisal-Weizman agreement)' নামে একটি দেশদ্রোহিতার চুক্তি সম্পন্ন করেন।

উপস্থাপকঃ

এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল এমন -

১. আরব রাষ্ট্র এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক এবং প্রতিশ্রুতি সদিচ্ছা এবং আন্তরিকভাবে সম্পন্ন হবে।

২. শান্তি সম্মেলনের আলোচনা শেষ হওয়ার পর আরব রাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ করা হবে।

৩. ফিলিস্তিন প্রশাসন সংবিধান প্রণয়নের সময় - ২ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে ব্রিটিশ সরকার বেলফোর চুক্তির মাধ্যমে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে - তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আগমনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও সাহস যোগানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে। পাশাপাশি বিস্তৃত বসতি ও ঘন ফসলের আবাদী ভূমি ব্যবস্থার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব এই ভূমিতে আগমনকারীদের স্থিতিশীলতার জন্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫. বিবাদমান দুই পক্ষের মাঝে সৃষ্ট যে কোন দ্বন্দ্বের সঠিক বিচারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে সোপর্দ করা হবে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এই চুক্তির ধারাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফয়সাল আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে সমতা রেখে, ইহুদী রাষ্ট্রকে 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু তাই নয় বরং উভয় পক্ষের পৃথক সীমান্ত করার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ আনোয়ার সাদাতই প্রথম আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে একতরফা শান্তি স্বাক্ষরকারী নয়।

পাশাপাশি এই চুক্তি ব্যাপকভাবে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আগমনের প্রতি জোরালোভাবে উদ্বুদ্ধ করছে এবং তাতে 'বেলফোর চুক্তি'র স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

মূলত ফয়সাল ইহুদীদের কাছে ফিলিস্তিন বিক্রি করে যে ভূমির মালিক হয়েছে, সেই ভূমিই সে ইংরেজদের থেকে পুনরায় ক্রয় করতে চাচ্ছে!!

গবেষক দানিয়াল (Danial):

দামেস্কে ফয়সালের রাষ্ট্র কায়েম করার আশা শেষ পর্যন্ত মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। কারণ ব্রিটিশরা সিরিয়ার কর্তৃত্ব ফরাসীদের হাতে স্থানান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এ কারণেই তাকে ইরাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং নামমাত্র 'বাদশা' বানিয়েছে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

অন্যভাবে বলা যায় যে, ফয়সাল সৌদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শয়তানের সাথে মিত্রতা গড়ে তুলেছে। দুনিয়া অর্জনের জন্য শয়তানের সাথে যারা বন্ধুত্ব করেছে, তাদের শাস্তি সুনিশ্চিত। জেনে রেখো! এই শাস্তি হলো - দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

مَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

"তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি"। (সূরা হাশর ৫৯ : ১৬)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আতাতুর্কি শাসন শুরু হলে এসকল মুখোশধারীর মুখোশ খুলে যায়। তারাই সর্বপ্রথম ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় এবং তুরস্কে ইসরাইলের একটি দূতাবাস খোলে। সেই সাথে নিরাপত্তা চুক্তি, সামরিক চুক্তি, যুদ্ধ মহড়া, অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং ন্যাটোতে যোগ দেয়। ইরাক, আফগানিস্তান এবং সোমালিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে তারা অংশ নেয়। এটি এখনও পর্যন্ত তুরস্ক সরকারের নীতি হিসেবে বলবৎ আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'সাইকস-পিকট' চুক্তির ভিত্তিতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সম্পত্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। আব্দুল আজিজ আল সৌদ - ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সিরিয়া, ইরাক ও ফিলিস্তিন বিভাজনকে স্বাগত জানান। বাহরাইনের ব্রিটিশ এজেন্টকে লেখা তার চিঠিতে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে।

উপস্থাপকঃ

বাহরাইনে ব্রিটিশ এজেন্টকে লেখা তার চিঠিতে আব্দুল আজিজ আল সৌদ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সিরিয়া, ইরাক ও ফিলিস্তিন বিভাজনকে স্বাগত জানিয়েছে। বার্তায় এসেছে যে, উল্লেখিত রাষ্ট্রগুলো গ্রেট ব্রিটেন ও তার মিত্র ফ্রান্সের মালিকানাভুক্ত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ আমি জানি যে, এই দুই দেশের অধীনে থাকাই শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একমাত্র উপায়।"

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এরপর ১৯৪৮ সালে লেবাননের সাথে ইয়াহুদিদের নাকবা চুক্তি হয়। আর যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বলা হয় যে, এটি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একটি 'স্থায়ী শান্তি চুক্তি'। এরপর আসে লুসান সম্মেলন। এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের দেওয়া প্রোটোকল দিয়ে শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ' বিভাজন প্রস্তাবের' স্বীকৃতি প্রদান করে।

উপস্থাপকঃ

চুক্তির ধারায় বলা হয়েছে;

জাতিসংঘ 'ফিলিস্তিন সমন্বয় কমিটি' নিয়োগ দেবে। আর এই কমিটির কাজ হবে - শরণার্থীদের বিষয়ে ১১ ডিসেম্বরের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী, তাদের 'অধিকার ও সম্পত্তি সংরক্ষণ' করার পাশাপাশি সীমান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদল এবং ইসরাইলের প্রতিনিধিদলকে কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে 'সংযুক্ত নথি'টি গ্রহণ করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া। নথিটি ছিল ১৯৪৭ সালের ফিলিস্তিন বিভাজন ঘোষণার এবং মানচিত্রে অঞ্চলগুলোর 'বিভাগ অংকনের' প্রশ্নের সমাধান বিষয়ক।

অন্য কথায় 'লুসান সম্মেলনে' আরব রাষ্ট্রগুলোর অংশগ্রহণের অর্থ হল - ফিলিস্তিন বিভাজনের সিদ্ধান্তকে মৌন সমর্থন করা।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

'লুসান সম্মেলনের' পর ইসরাইল জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দেয়। সেখানে তারা আরব ও মুসলিম বিশ্বের সদস্যসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তাব করে। তারা এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয় যে, 'জাতিসংঘ সনদের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সকলেই যেন ইসরাইলের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে'।

উপস্থাপকঃ

জাতিসংঘের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যা রয়েছে, তা নিম্নরুপ:

“জাতিসংঘ তার সকল সদস্য রাষ্ট্রের মাঝে সমান সার্বভৌমত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে”। যেমন, মিসরের ভূখন্ডের উপর তাদের যেমন কর্তৃত্ব রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলের কর্তৃত্ব সমান।

এই অনুচ্ছেদে আরও রয়েছে যে,

“আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কমিশনের সকল সদস্য দেশের অখণ্ডতা এবং কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি বা শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমন কোন উপায়ে হস্তক্ষেপ করাও বৈধ হবে না যা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক”।

সনদের ২৫ নং অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে:

এই সনদ অনুযায়ী “জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সকল প্রস্তাব গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে”।

এই চুক্তি অনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ - ঐ প্রতিশ্রুতি যদি কোন রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ধারার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ধারাগুলোকে বিবেচনা করতে হবে।

পূর্বের ধারাগুলো থেকে বুঝা যায় যে, আরব ও ইসলামী যে সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘের চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের জন্য নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলো মেনে চলা আবশ্যক।

১. ইসরাইলী নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলীদের নেতৃত্বকে এমনভাবে নিতে হবে, যেন তারা নিজ ভূমিতেই নিজেদের কর্তৃত্ব করছে। আর তা হবে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত দেশ বিভক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

২.আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলী ভূমির ঐক্য, শান্তি এবং সীমান্ত নিরাপত্তার প্রতি আন্তরিক হবে।

৩.আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলের সাথে যে কোন দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাথে সাথে ইসরাইলের বিরূদ্ধে শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ধরণের হুমকি দিতে পারবে না।

৪.আরব রাষ্ট্রগুলো 'নিরাপত্তা পরিষদের' সকল রায়কে কার্যকর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে ইসরাইল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে।

৫. অন্য যে কোন চুক্তির উর্ধ্বে 'জাতিসংঘ চুক্তি'কে মেনে নেয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

যে সকল আরব রাষ্ট্র প্রধানরা জনসম্মুখে ইসরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তাদের মিথ্যাচারগুলো পূর্বোল্লিখিত চুক্তিগুলো থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ তারা জাতিসংঘের চুক্তির ধারাগুলো মেনে নেয়াকে নিজেদের জন্য অবধারিত মনে করে। যেমন ইসরাইলকে হুমকি না দেয়া, ইসরাইলী ভূমির নিরাপত্তা, ঐক্যের বিষয়ে আন্তরিক হওয়া ইত্যাদি। আর এগুলোতো ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর।

ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোসে শারেট (Mosche Sharrett):

ইসরাইল রাষ্ট্রটি জাতিসংঘেরই সৃষ্ট একটি রাষ্ট্র। তাই যে সৃষ্টি করেছে তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য ইসরাইল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জাতিসংঘের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসরাইলের তার পুরো রাষ্ট্রনীতি গড়ে তুলবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করা কেবল একটি পদক্ষেপ নয়, বরং তা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ এটি মানুষের মনে থাকা ঐ সন্দেহ দূর করবে যে, ইসরাইল কখনো হারিয়ে যেতে পারে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

১৯৫৫ সালে জামাল আব্দুন নাসের ইন্দোনেশিয়ার বানদাং সম্মেলনে বার্মার প্রেসিডেন্ট উনোর সাথে কথা বলেন এবং ১৯৪৭ সালের ফিলিস্তিন বিভাজন প্রস্তাবের স্বীকৃতি নিশ্চিত করেন। তিনি একটি চিঠিতে নিশ্চিত করেন যে, যদি বাস্তবে দেশভাগের প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং তা কার্যত বাস্তবায়ন করা হয়, তবে তিনি 'বানদাং সম্মেলনে' ইসরাইলের উপস্থিতি মেনে নিতে প্রস্তুত। কারণ এটি ইসরাইলের জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাবের অধীনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা আঁকা সীমার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৬৭ সালের ৩য় নাকাবা চুক্তির পরেই, মিশরের ইতিহাসে ইসরাইলের কাছে আত্মসমর্পণের মতো অবক্ষয়ের সূচনা হয়।

সাংবাদিক হানী শুকরুল্লাহ (Hani Shukrullah):

১৯৬৭ সালের জুন মাসের পরাজয় - আমার জীবনের এক বিরাট অভিজ্ঞতা। যদিও এখন তার বর্ণনা দেয়াটা কঠিন। কারণ এই পরাজয় ছিলো মানুষের ধারণাতীত বিষয়। ঘটনাটি পরিষ্কার মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশে হঠাৎ বিজলি চমকে উঠার মত ছিল।

ছয় দিনে নয়, বরং ছয় ঘণ্টার এক যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং ময়দান থেকে পালাতে শুরু করে। এমনকি নিজেদের হেলমেট ও অস্ত্র ফেলে তারা পালাতে শুরু করে। একই সময়ে ইসরাইলী সৈন্যদেরকে সুয়েজ খালের তীরে উলুধ্বনি দিতে দেখা যায়। এটা ছিলো মিশরের জন্য অনেক বড় অপমান ও লজ্জাজনক বিষয়।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এই অধঃপতনের কয়েকটি চিত্র - যেমন:

১৯৬৭ সালের নভেম্বরে 'নিরাপত্তা চুক্তি'র ২৪২ ধারার উপর জামাল আব্দুন নাসের এর একমত পোষণ করা। অবশেষে ১৯৭০ সালে করা, উইলিয়াম রোজার্সের চুক্তির সাথেও সে একমত পোষণ করে। এই উভয় চুক্তিতেই ১৯৬৭

এর ৫ই জুন পর্যন্ত দখল করা ভূমিসহ ইসরাইলের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং আরব ইসরাইলের মাঝে স্থায়ী শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এভাবেই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও ফিলিস্তিন শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়টি গুরুত্বহীনভাবে পড়ে থাকে।

এই সম্পর্কে "হাইকাল" লিখেন যে, ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের পর জামাল আব্দুন নাসের বুঝতে পারে যে, ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলার পরিস্থিতি এখন আর নেই। ফলে সে নিরাপত্তা চুক্তির ২৪২ নাম্বার ধারাটি মেনে নেয়। তেমনিভাবে সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে কোনো সংগঠনের সাথে এমনকি ইসরাইলের সাথেও পরস্পর আলোচনায় বসতে উদ্বুদ্ধ করে। এই ভিত্তিতে যে মিসর দুটি শর্তে পারস্পরিক সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে;

১. মিশরকে তার শক্তিবলে দখল করা ভূমিসমূহ ছেড়ে দিতে বলা হবে না।

২. মিসরকে সরাসরি ইসরাইলের সাথে পারস্পরিক আলোচনার টেবিলে আসতে বলা হবে না, যতক্ষণ না ইসরাইল দখলদারিত্ব বন্ধ করে।

সংক্ষেপে জামাল আব্দুন নাসের এর ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, ১৯৬৭ সালের পরাজয়ের পূর্বেই সে ১৯৪৭ এর আরব-ইসরাইলের মাঝে ফিলিস্তিন বিভক্তির চুক্তির উপর একমত পোষণ করেছিল।

অত:পর পুনরায় আক্রমণের পর সে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও ফিলিস্তিনী মুহাজিরদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়াকে অসম্ভব ভাবতে শুরু করে। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ধারার ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি গ্রহণ করে। যেই চুক্তিতে ১৯৬৭ সালের ৫ই জুনের আগ পর্যন্ত দখল করা স্থানসহ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

অবশেষে মিসরের ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট গাদ্দার - আনওয়ার সাদাত এর আগমন ঘটে। সে ইসরাইলের সাথে দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

প্রথমত, ১৯৭৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত হওয়া 'ক্যাম্প ডেভিড ঐক্য চুক্তি'। (যেটার অন্তর্ভুক্ত ছিল শান্তি চুক্তি ও স্বশাসন চুক্তি)

দ্বিতীয়ত, ১৯৭৯ সালের ২৬ শে মার্চ এর 'শান্তি ঐক্য চুক্তি'।

গাদ্দার আনওয়ার সাদাত (Anwar al Sadat):

আমরা সম্পূর্ণ সদিচ্ছা ও বিশ্বাস নিয়ে 'ক্যাম্প ডেভিড' এ এসেছিলাম। কিছুক্ষণ আগে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'ক্যাম্প ডেভিড' থেকে বের হয়ে এসেছি।

অপরাধী মিনইয়ানিম বেগেন (Minyanim Begen):

ক্যাম্প ডেভিডের নাম পরিবর্তন করে একে আমরা 'জিমি কার্টার কনফারেন্স' নামে নামকরণ করবো। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে আমার বিশ্বাস যে, আপনি খুব পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। আমাদের বাপ- দাদারা মিশরে পিরামিড তৈরিতে যে পরিশ্রম করেছে, আপনি তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

তার এই গাদ্দারী দেখে, তারই অনুগত এবং তার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আব্দুল গনী আল জিমসি চুপ করে থাকতে পারলেন না।

উপস্থাপকঃ

'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তিটি ছিলো মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির সর্বশেষ পরিস্থিতি। অবশেষে মার্কিন জোটের সুবিধার জন্যই দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের মাঝে চলমান যুদ্ধটি আন্তর্জাতিক সমতার উপর ভিত্তি করে সমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধ ১৯৫৬ সালে শুরু হয়ে, ১৯৬৭ সাল গড়িয়ে ১৯৭৮ সালে এসে পরিপূর্ণ রূপে বন্ধ হয়।

এই চুক্তির কারণেই আরব ইসরাইলের মাঝে চলমান যুদ্ধ থেকে মিশরকে বেরিয়ে আসতে হয়। এর ফলে আরব রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইসরাইল ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে ভিন্ন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এবং বাকি ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের ভূমি দখলের স্বাধীনতা পেয়ে যায়।

স্বদেশ পর্যায়ে এই চুক্তি এবং মিশর ও ইসরাইলের মাঝে শান্তি চুক্তি নতুন সিনাই পর্বতকে বিভিন্ন কঠিন কঠিন শর্ত সাপেক্ষে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে এই চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইল একটি শক্তিশালী কৌশল অবলম্বনে সক্ষম হয়। এই চুক্তির ফলে, একটি পর্যায়ে মিশর এবং ইসরাইলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। যা ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হয় এবং ১৯৭৭ সালের আল কুদস পরিদর্শনের মাধ্যমে যা মহা আকার ধারণ করেছিল। অবশেষে ১৯৭৮ এর 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তির মাধ্যমে এর অবসান হয়।

দু'দেশের চুক্তির ধারাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করার পর এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এই অঞ্চলে নতুন কোন সংকট শুরু হয়েছে। এটা মধ্যপ্রাচ্যের দুই শক্তিধর দেশের যুদ্ধে গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। এমনকি আরব রাষ্ট্রগুলোতেও এর প্রভাব ও ফলাফল বিরাজমান ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো - এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে "মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা" হিসাবে পরিবর্তন করা, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

আর এভাবেই, স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মিশর ক্রুসেড ঝড়ের মুখে বিশ্বাসঘাতকদের মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। এতকিছুর পরও একদল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুজাহিদ তাদের সামনে মাথা নত করেননি। তারা যুগের ফেরাউনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

আমরা ধারাবহিকভাবে আরও অনেক বিশ্বাসঘাতক এবং দ্বীন ও দেশ বিক্রেতার বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আনওয়ার সাদাতের এই বিশ্বাসঘাতকতার (ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান এবং তথা কথিত শান্তি চুক্তি) পর থেকে ফিলিস্তিনী স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিস্তেজ করে দিতে উপসাগরীয় অঞ্চলের সম্পদগুলো ব্যয় হতে থাকে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামনে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

উপস্থাপকঃ

“হাইকাল” লিখেন:

তেল রপ্তানিকারক কিছু রাষ্ট্র নিজেদের মাঝে গোপন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাদের সিদ্ধান্তটি ছিল এই যে, রাজনৈতিকভাবে আমরা চুপি-চুপি একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাবো। কিন্তু মূল উত্তেজনার সময় ফিলিস্তিনী মুক্তিকামী সংগঠনকে ধন সম্পদের লালসায় ফেলে রাখবো। যাতে তারা চুপ-চাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকে। কারণ ফিলিস্তিনী বিদ্রোহ এখন এমন এক নাজুক হালতে পৌঁছেছে, ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্তই নেই।

একারণেই আন্দোলনগুলো সম্পূর্ণ পেট্রোডলার নির্ভর হয়ে পড়ে। আর পেট্রোডলারের এই বিষয়টি সর্ব প্রথম বাস্তবায়ন করা হয় বৈরুতে। অবশেষে সহীহ আকিদা লালনকারী, গেরিলা যোদ্ধা, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের সাথে ধনকুবের, সুন্দরী নারী ও প্রভাবশালী নেতাদের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

কিন্তু এ অঞ্চলের কিছু বিশ্বাসঘাতক ও গাদ্দার তাদের বিষবাষ্প ছড়াতে শুরু করেছে। তাদের প্রধান ছিল গাদ্দার আবু মাজিন। হামাসের পক্ষ হতে যাকে মহান নেতা নামে ভূষিত করা হয়। সে ১৯৭৭ সালের ১২ই মার্চ ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করে ও তা কার্যকর করতে সক্ষম হয়। সে সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনের জনগণের স্বার্থের সাথে মিল রেখে পরাশক্তি ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রতি আহবান জানানো হয়। ফলে দিন দিন তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

এই অবনতির ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর আলজেরিয়ায় সংগঠিত এক জরুরী অধিবেশনে ফিলিস্তিন মুক্তিকামী সংস্থা জানায় যে, গাজায় এবং পশ্চিম তীরে স্বতন্ত্র ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তার রাজধানী হবে আল-কুদস (জেরুজালেম)। একই সাথে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে, জেরুজালেম ইসরাইলের আওতাধীন থাকবে। আর ২৪২ ও ৩৩৮ ধারা মোতাবেক এই বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

১৯৯৬ সালের ২৪ শে এপ্রিলে, গাজায় ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদ তার ২১ তম অধিবেশনের আয়োজন করে। এতে ফিলিস্তিন জাতীয় চুক্তির 'জায়নবাদী এবং পিএলওর' স্বীকৃতির পরিপন্থী বিভিন্ন ধারা বাতিল করার উপর ভোটদান শেষ হয়।

এরপর থেকে পরাজয় এবং খেয়ানতের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে। এভাবে বাদশাহ ফাহাদের উদ্যোগ, আরবীয় শান্তি উদ্যোগ, ওয়াদি আরাবা, মৌরিতানিয়ার দূতাবাস, কাতার, বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ এই সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের কাতারে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বারংবার বৈঠকের মধ্য দিয়ে পরাজয় ত্বরান্বিত হতে থাকে।

সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু (Netanyahu):

এখন তো আরব বিশ্বের এবং ইসরাইলের কোম্পানীগুলোর সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এখন কি ফিলিস্তিনীদের সাথে নিরাপত্তা কার্যক্রম বাদ দিয়ে শুধু আরব বিশ্বের সাথে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? হ্যাঁ, এটা আবুধাবি এবং কাতারে সম্ভব। কারণ এই বিষয়গুলো প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ হচ্ছে। আচ্ছা এই বিষয়টা থাক। আশা করি আপনারা এই বিষয়গুলো অন্যান্য সাক্ষাৎকারে শুনবেন এবং পরস্পর সংগঠনের সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

আমার আরব আমিরাতের যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন যায়েদ এবং সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন? ইহুদীরা ইসরাইলকে যতটুকু সহযোগিতা করে এই দু'জন তাদেরকে ইহুদীদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সাহায্য সহযোগিতা করে।

সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু (Netanyahu):

নি:সন্দেহে সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তন হল আরব ও ইসরাইলের মধ্যকার বন্ধুত্ব। ইসরাইল এবং আমাদের প্রতিবেশি আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার এই সম্পর্ককে আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল মধ্যপ্রাচ্যে জিহাদ মুক্ত ইসলামের প্রচলন করা।

ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অন্যতম কারিগর হামদ বিন জসিম (Hamd bin Jasim)

আমরা সন্ত্রাসীদেরকে সব সময় হুমকি ধমকির মধ্যে রাখবো এবং ভূমি দখলে রাখার ক্ষেত্রে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবো। বিশেষ করে ইসরাইল এবং তার আশপাশের ভূমিগুলোর ক্ষেত্রে আরও বেশী তৎপর থাকবো। আমি মিশর, সৌদি, কাতারসহ পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় ইসরাইলীদের ভিশনের বাস্তবায়ন দেখতে চাই। ঠিক যেমনভাবে ইসরাইলে আরবদের ভিশন দেখতে চাই। আমার মনে হয় এটাই হল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যার জন্য আমরা সকলে একচেটিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এরপর আগমন ঘটে মুহাম্মাদ মুরসীর। সেও এসে একই বক্তব্য দেয় যে, ইসরাইলসহ আরও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সকল নিরাপত্তা চুক্তি এবং যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছিল সেগুলো সে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করবে। এ বিষয়ে তার কোন রকম ত্রুটি থাকবে না।

হাসান আল বান্না (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) জিহাদী সংগঠনগুলোকে ফিলিস্তিনে সমবেত করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে নবীন প্রজন্ম নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করে। দেখা যায় তারাও প্রবীনদের মতো ইসরাইলের সাথে শান্তি এবং অপমানজনক চুক্তিগুলো পালনের ঘোষাণা দেয়।

আল্লাহ ড. রানতিসির উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি ঘোষণা দেন যে, আমরা অবশ্যই ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আমেরিকাকে অবরোধ করব!

আল্লাহ শাইখ নাজ্জার রাইয়ান এর উপর রহম করুন। তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের মাঝে এবং ফাতাহের মাঝে চলমান লড়াই হলো, ইসলাম এবং রিদ্দাহর লড়াই। কারণ ফাতাহের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা নাস্তিক, যাদেরকে আমেরিকাসহ

ইসরাইল লালন পালন করছে। আমেরিকা ইসলামকে আমাদের ভূ-খন্ড থেকে বিতাড়িত করার জন্য – ফাতাহ নেতৃত্বস্থানীয়দের সম্পদ এবং সব ধরণের উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

এরপর এলো, মুসলিমদের থেকে চুরিকৃত সম্পদের মাধ্যমে গড়ে তোলা ভাড়াটে মিলিশিয়া নেতা এবং নিকৃষ্ট পুতুল সরকার - মুহাম্মাদ বিন যায়েদের যুগ।

সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু (Netanyahu):

আমি মহান নেতা মুহাম্মাদ বিন যায়েদের সাক্ষাতের পর তিনটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রথমত; আমি অচিরেই একটি সফর করবো।

দ্বিতীয়ত; গ্রীনকার্ডের (ইসরাইলীদের সৌদি নাগরিকত্ব বিষয়ক) কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি।

তৃতীয়ত, এখানে ইসরাইলীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরাইলে বিভিন্ন খাতে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা চিন্তাভাবনা করছি কোন কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায়? আর এটাই ইসরাইলের অর্থনীতির চাকাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এরপর এলো সুদানের ভাড়াটে নেতা বুরহান। তারপর এসেছে পশ্চিমাদের সাহায্যকারী ষষ্ঠ মুহাম্মাদ আস সাদিস। সে দীর্ঘদিন ইসরাইলের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখার পর প্রকাশ্যে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু (Netanyahu):

ইসরাইলের সাথে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্থাপনের সিদ্ধান্তের জন্য আমি মরক্কোর মহামান্য রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এসব ছিলো হৃদয় বিদারক ইতিহাস। এভাবেই অধ:পতনের ধারা অব্যাহত আছে। প্রতিটি পরাজয় আরেকটি পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। অত:পর তারা একে অপরকে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক বলে অবহিত করতে থাকে। তাদের থেকে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়? তারাতো এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের কারিগর হামদ বিন জাসিম

আরবরা মনে করে ইসরাইল হল হোয়াইট হাউজের মূল চাবিকাঠি এবং আমেরিকান সিনেটরদের নিয়ন্ত্রক। এটি একটি কঠিন বাস্তবতা। আমরা কাতারে ইসরাইলের সাথে আলোচনা করে, দোহায় ইসরাইলের একটি দূতাবাস খুললাম, কেননা আমরা শান্তি প্রত্যাশী ছিলাম। তখন সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদিআরব আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিলো যে, আমরা আরব জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো। সেসময় আমরা আরব জাতি ও ফিলিস্তিনিদের বিরোধিতার কারণে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারিনি!!

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

আল্লাহ তায়ালা এ জাতির মাঝে এমন ব্যক্তিদের পাঠাবেন যারা উম্মাহর এই অধঃপতন মেনে নিতে পারবে না। এরপর মুজাহিদদের নেতা আব্দুল্লাহ আযযামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি এসে ঘোষণা করেন যে, আন্দালুসের পরাজয়ের পর থেকেই তোমাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে।

শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহঃ

কিতাল হলো একটি স্থায়ী ইবাদত, যা শুধু আফগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন স্থানেই সেটা স্থবির হয়ে যায় না, বরং তা একটি স্থায়ী ইবাদত। সালাত ও সাওম যেমন ফরয, কিতালও তেমনি একটি ফরয ইবাদত। প্রতিটি স্থানে তা অবিরাম

চলতে পারে, যদি সেখানে কুফুর প্রকাশ পায়। আর প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। যতক্ষণ না প্রতিটি মুসলিম ভূ-খণ্ড কাফেরদের কবল থেকে মুসলমানের আওতায় আসে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

তারপর আসলেন উমর আব্দুর রহমান। তিনিই মুসলিমদেরকে আমেরিকান বিমান ভূপাতিত করতে এবং জাহাজ ডুবানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

শাইখ উমর আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহ:

ইহুদী, খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের পথ অনুসরণ করবেন। নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইহুদীর কাছে অধিক প্রিয়, যার প্রতি ইহুদী ও নাসারা সন্তুষ্ট। এ ভাবেই অপমান, অপদস্থতা ও খেয়ানতের চুক্তি কার্যকর হয়। আর এই চুক্তির সাফাই গেয়ে বেড়ায় ভাড়াটে শাসকগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবীরা। তারা মনে করে মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাকে আবশ্যক মনে করে থাকে। (যদিও সে হয় মুসলিম ভূমি দখলকারী বা মুসলিম হত্যাকারী।)

আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, যাতে এসব ভন্ডদের হাশর ইহুদীদের সাথে হয়।

প্রশ্ন হলো এটা কীভাবে সম্ভব? এবং আমরা কীভাবে তা ভাবতে পারি? তা এজন্য যে, উলামায়ে কেরাম এদের ব্যাপারে একমত যে - নানা সম্মেলনে ইসলাম বিরোধী বক্তৃতা দেয়া এবং জাতীয়তাবাদ ও আরববাদের প্রতি আহবান জানানোর কারণে তারা মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে গেছে। অথচ ইসরাইল বিষয়ে কুরআনের প্রকৃত চিকিৎসা ছিলো; ইসলামের চূড়া এবং মূল ভিত্তি জিহাদের পথ তথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

তারপর আসলেন উসামা বিন লাদেন। যিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছেন যে, আমেরিকা কিছুতেই নিরাপদে থাকতে পারবে না, যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারবো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভূমি থেকে সকল কুফফার বাহিনী বের হয়ে যাবে।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ:

ঐ আল্লাহ তায়ালার শপথ, যিনি আসমানকে খুঁটিহীনভাবে উত্তোলিত রেখেছেন। আমেরিকা ও তার অধিবাসীরা কিছুতেই নিরাপদে থাকতে পারবে না, যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারবো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমি থেকে সকল কুফফার বাহিনী বের না হবে। আল্লাহু আকবার, সম্মান একমাত্র ইসলামের। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

অত:পর এসেছেন ড. আব্দুল আজিজ রানতিসি রহিমাহুল্লাহ। যিনি আমেরিকান পণ্য, পর্যটন ও মিডিয়াকে বয়কট করার আহবান জানিয়েছেন এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে ভয়ঙ্কর অবরোধ করার আহবান জানিয়েছেন।

ড. আব্দুল আজিজ রানতিসি রহিমাহুল্লাহ:

শেরনসহ ইয়াহুদী জনগোষ্ঠীর নেতারা কখনো নিরাপদে থাকতে পারবে না। কারণ এই ভূমি হলো ইসলামের জন্য ওয়াকফকৃত ভূমি। ফিলিস্তিনের এক বিগত ভূমি পরিমাণ জায়গাতেও আমরা তাদের অবস্থান মেনে নিব না। প্রতিটি স্থানে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তাদেরকে ধাওয়া করবো এবং আমাদের মুখোমুখি হওয়ার পরিণাম বুঝিয়ে দেবো।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

ফিলিস্তিন এবং পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনাদের উপর আবশ্যক হলো - যারা ফিলিস্তিনের সামান্য পরিমাণ ভূ-খণ্ডও ছেড়ে দিতে চায়, তাদেরকে দৃঢ়ভাবে রুখে দেওয়া। সে যেই হোক না কেন। আপনাদের আরও কর্তব্য হলো - যারা হীনমন্য হয়ে মুসলিম ভূমি ছেড়ে দিতে চায়, তাদের থামিয়ে দেয়া। আর তাদের বলে দিন যে, ফিলিস্তিনী উলামায়ে কেরাম গত ২০ শে শাওয়াল ১৩৫৩ হিজরী মুতাবেক ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদুল আকসায় সংগঠিত একটি বৈঠকে সুস্পষ্ট ফাতওয়া দিয়েছেন যে, "ইহুদীদের নিকট ভূমি বিক্রি করা হারাম"।

সেই ফাতাওয়া নিম্নরূপ:

ইরাক, মিশর, হিন্দুস্তান, মরক্কো, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আলিমদের ফাতওয়া পর্যালোচনায় এসেছে যে, ইহুদীদের নিকট ফিলিস্তিনী ভূমি বিক্রি করা হারাম এবং এর মধ্যস্থতা, সহযোগিতা করাও হারাম। এ সমস্ত বিষয়াদিতে সন্তুষ্ট হওয়া ও জেনেশুনেও চুপ থাকা হারাম। যেহেতু প্রত্যেক ফিলিস্তিনি নাগরিক এই ফাতওয়া জানে এবং এর ফলাফলের বিষয়ে সন্তুষ্ট সেহেতু যে ব্যক্তি ফাতওয়া লঙ্ঘন করাকে বৈধ মনে করবে, সে কাফের এবং মুরতাদ হয়ে যাবে।

যেমনটি কুদসের মুফতি, ইসলামী শূরার উচ্চপদস্থ নেতা 'সায়্যেদ আমীন হোসাইন' এর ফতোয়ায় এসেছে যে, সমস্ত বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা এবং দলিলের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে,

ইহুদীদের নিকট ফিলিস্তিনের ভূমি বিক্রেতা কয়েক কারণে অপরাধী।

১. মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করার ব্যাপারে পদক্ষেপগ্রহণকারী এবং সাহায্যকারী।

২. মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করা থেকে বাঁধা প্রদানকারী এবং তা বিরান করার জন্য সচেষ্ট।

৩. ইয়াহুদীদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণকারী। কেননা তার সকল কার্যক্রম মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ইয়াহুদীদের পক্ষে সাহায্য হিসেবে ধরা হবে।

৪. আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের কষ্টদানকারী।

৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আমানতের খেয়ানতকারী।

সুতরাং সকল কারণ, ফলাফল, ফতোয়া ও আহকাম পর্যালোচনা করার মাধ্যমে একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, ইয়াহুদিদের কাছে ফিলিস্তিনের ভূমি বিক্রেতা, (চাই তা সরাসরি হোক বা অন্য মাধ্যমে হোক) বিক্রয়ের বিষয়ের দালাল, সাহায্যকারী এদের একজনেরও জানাজা পড়া যাবে না। তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। তাদের লাশ ফেলে দিতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের লাঞ্ছিত করতে হবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার ভালোবাসা দেখানো যাবে না। যদিও তারা বাবা, ছেলে ভাই বা স্ত্রী হোক না কেন।

কুরআনে বর্ণিত আছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।” (সূরা তাওবা ৯ : ২৩)

কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“আপনি বলুন: তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক

প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (সূরা তাওবা, ৯:২৪)

আর এদের এইসব জঘন্য কর্মকাণ্ড দেখেও চুপ থাকা এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অকাট্টভাবে হারাম।

যখন দেশ ইয়াহুদী রাষ্ট্র হওয়ার সম্ভাবনার কারণে ভূমি বিক্রি করা হারাম, তাহলে ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি, যে ইয়াহুদীকে মালিক স্বীকার করে দেশকে ইয়াহুদী রাষ্ট্র বানিয়ে নিরাপদে আছে?

ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাইগণ!

যে নাকি ফিলিস্তিনের কোন মাটি ইয়াহুদীদের জন্য ছেড়ে দিবে অথবা তার ব্যাপারে সাফাই গাইবে, সে যেই হোক না কেন তার সম্মুখে এই ফতোয়া প্রধান করুন। সে যেই হোক না কেন!

শাইখ খালিদ বাতরাফি হাফিযাহুল্লাহঃ

বর্তমান ফিলিস্তিন ইস্যু একটি প্রধান ইস্যু। যা দ্বীনদার ও উম্মাহর আত্মমর্যাদাশীল প্রত্যেক মুসলমানকে ব্যথিত করে। বর্তমানে এমন কোনো সচেতন মুসলিম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা পৃথিবীতে কী ঘটছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করা হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে পারেনা বা জানে না। এই কুদস নবীদের সরদার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের রাতে অবস্থানস্থল। সেই পবিত্র ভূমিতে মুসলিম ভাইদের উপর আপতিত জুলুম, নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী এমন কোনো মুসলিমকে পাওয়া যাবে না, যারা ছিনতাইকারী ইহুদীদের কবল থেকে পবিত্র আকসাকে উদ্ধার করার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে জিহাদের ইচ্ছা পোষণ না করে বসে থাকে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

এই সকল বিশ্বাসঘাতকদের অবমাননা এবং প্রতারণায় আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। আবেগময় প্রতিক্রিয়া এবং জ্বলন্ত বক্তৃতাগুলো থেকে আমাদের অর্জন করার মত কিছুই নেই। এটি আমেরিকা কর্তৃক পরিচালিত একটি ধর্মযুদ্ধ এবং ইসরাইল এই ধর্মযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের একটি। ইসরাইল হল পারমানবিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্রুসেডারদের একটি দূর্গ, যেটিকে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। এই দূর্গটিকে আমেরিকা অতীতে ফিলিস্তিনে ক্রুসেডার কর্তৃক নির্মিত দূর্গগুলোর মতই স্থাপন করেছে।

শাইখ আবদুল ইলাহ হাফিযাহুল্লাহঃ

আমেরিকা ইহুদীরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আমেরিকা ইহুদী রাষ্ট্রকে অর্থ এবং সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে। আমেরিকা ছাড়া এই ইহুদী রাষ্ট্রের নিজের উপর ভর করে টিকে থাকা অসম্ভব। তাই আমেরিকা, আমেরিকার অর্থনীতি এবং সমগ্র বিশ্বে আমেরিকার সামরিক স্বার্থকে টার্গেট করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করা এই ক্যান্সারটিকে সাহায্য করা বন্ধ করে এবং আমেরিকা তার সামরিক সৈন্যদের পুরো পৃথিবী থেকে প্রত্যাহার করে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

এটি হল তাদের এবং আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বাস্তবতা। আমাদেরকে এই দ্বন্দ্বে জড়ানোর জন্য অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং আমাদের এই ক্রুসেড যুদ্ধের মুখোমুখী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

অতীতে আমাদের উম্মাহ ক্রুসেড যুদ্ধগুলোকে সফলভাবে মোকাবেলা করেছিল। এগুলোর মধ্যে একটি হল মঙ্গলদের আক্রমণ। তারা এই আক্রমণকে প্রাণবন্তভাবে মোকাবেলা করেছিল এবং মুসলিম জাতির মধ্যে দুর্বলতা এবং দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও তারা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তারপর এসেছিল উসমানীয় শাসনব্যবস্থা, যেটি পাঁচ শতক ধরে মুসলিম অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত রেখেছিল এবং নতুন নতুন ভূমি জয় করেছিল। গ্রানাডা পতনের পঞ্চাশ বছর পূর্বে, উসমানীয় শাসনব্যবস্থা কন্সটান্টিনোপল (সনাতন খ্রিস্ট সমাজের পূর্বেকার রাজধানী) কে ইসলামের আওতায় তাওহীদের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ২০০১ সালে মাত্র ১৯ জন মুজাহিদ – আমেরিকার একেবারে কেন্দ্রে ছুরিকাঘাত করেছিল।

আমেরিকা এইরকম একটি আঘাতের স্বাদ পূর্বে কখনোই লাভ করেনি। আর বিশ বছর যুদ্ধের পর আজ এই অভিযানটিই আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকে বের করেছে, তাদের দুর্বল করেছে এবং পরাজিত করেছে। সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

শাইখ আবু উবাইদা ইউসুফ আল আন্নাবি হাফিযাহুল্লাহঃ

পরিশেষে, আফগানদের এই পরিণতি আপনাদের জন্য একটি সেরা উদাহরণ। তাদের পথ অনুসরণ করুন। তারা বিতর্ক এবং মতবিরোধ পরিত্যাগ করে, একটি পতাকা ও একটি নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ হয়েছিল। তারা তাদের নেতৃত্ববৃন্দের বিশ্বাস, জ্ঞান এবং আন্তরিকতায় আস্থা রেখেছিলেন। তারপর খরিদদার শাসনব্যবস্থা এবং বিশ্বাসঘাতক সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এবং জিহাদ ও শাহাদাতের পথ গ্রহণ করেছিল।

তাদের বন্দুকগুলি তাদের কাঁধে বিশ্রাম নিত। তাদের প্রাণগুলো ছিল তাদের হাতের তালুতে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদের শত্রুদের পরাজিত করেন।

এভাবেই শত্রুরা তাদের কাছে অপমানিত হয়েছে। আজ ট্রাম্প ‘ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি (শতাব্দীর চুক্তি)’ প্রস্তাব করেছে। লজ্জায় তার মাথা নিচু করেছে, কারণ সে আফগানদের কাছ থেকে ‘শতাব্দীর চরম পতন’ লাভ করেছে।

অপমানের দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ে না,

আগুনের নিক্ষেপ ছাড়া।

স্বাধীন ব্যক্তি নেতৃত্ব ত্যাগ করে না,

কাফির কিংবা পাপীর জন্য।

রক্ত ঝরানো ব্যতীত,

অপমান কপাল থেকে মুছে যায় না।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

সুতরাং যারা হতাশা, অপমান, ভয় এবং আত্মসমর্পণের দিকে আহবান করে তাদের থেকে সাবধান।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আমরা অবশ্যই এই মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হব। আর এই যুদ্ধে আমাদের প্রধান অস্ত্র হল 'সঠিক জ্ঞান'। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে: কে আমাদের শত্রু? এবং কে আমাদের বন্ধু?

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা মায়িদা ৫ : ৫১)

শাইখ আবু উবাইদা ইউসুফ আল আন্নাবি হাফিযাহুল্লাহঃ

ফিলিস্তিন মুক্ত করার গোড়াপত্তন হবে - বিশ্বাসঘাতক শাসকদের কবল থেকে ফিলিস্তিন মুক্ত করার মাধ্যমে। যে কোন পরিকল্পনা, যেটি বিশ্বাসঘাতক শাসকের সাহায্য কিংবা সহায়তার সাথে জড়িত অথবা নির্ভরশীল, সেটা কোনো মুক্তির পরিকল্পনা নয় বরং এটি একটি দখলদারিত্বের পরিকল্পনা।

যে কেউই ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য যদি বিশ্বাসঘাতক শাসকের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেও একজন বিশ্বাসঘাতক। সে হল তার উম্মাহ ও ধর্মের বিশ্বাসঘাতক।

এই চরম পরিস্থিতিতে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের অবশ্যই স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং স্পষ্টবাদী হতে হবে। এই সকল বিশ্বাসঘাতক শাসকদের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপরই তাদের বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাঁর উপরই আস্থা রাখতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজেদের সক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হবে আলজেরিয়ান ভাইদের মত, যারা যুদ্ধ করেছিল ন্যাটো এবং ফ্রান্স দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে।

১৯৫৪ সালের নভেম্বরে যখন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাদের জিহাদ শুরু করবে, তখনও তাদের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ জন যুবকের বেশী ছিল না। তাদের নিকট শিকারী বন্দুক, জনসাধারণ কর্তৃক দানকৃত এবং দখলদারদের ব্যাংক থেকে ছিনিয়ে আনা সামান্য পরিমাণ টাকা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

তবে তাদের সংকল্প ইস্পাতের মত কঠিন ছিল। আকাশের ন্যায় উচ্চ সাহস তারা দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের বিশ্বাস পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর ছিল। তাই জনসাধারণ তাদের পিছনে সমবেত হয়েছে এবং এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ শুরু করেছিল।

এটিই একমাত্র পথ যা ফিলিস্তিনকে মুক্তির দিকে পরিচালিত করবে। তাছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

যেহেতু আমরা এক উম্মাহ, আমাদেরকে অবশ্যই একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের ফিলিস্তিনই কাশ্মীর, কাশ্মীরই গজনী, গজনীই ইদলিব, ইদলিবই কাশগড় এবং কাশগড়ই হল ওয়াজিরিস্তান।

উপস্থাপকঃ

ইসলামের শহীদ, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আমাদের উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের স্বাধীনতার দিকে তাক করা। হ্যাঁ, আফগানিস্তান অবশ্যই স্বাধীন করা হবে। কারণ এই নীতি আমাদের ধর্মের অংশ এবং আমাদের উপর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আমরা অবশ্যই জেরুজালেম স্বাধীন করব এবং আল-আকসাকে 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র পতাকা তলে, তাওহীদের ছায়ায় ফিরিয়ে আনব। আল্লাহ তায়ালা বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা তাওবা ৯:১২৩)

আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন যেখানে হাতগুলো বেধে ফেলা হয়েছে, হাতগুলো গলার সাথে বাঁধা হয়েছে, পাগুলো শেকল বন্দী করা হয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিষিদ্ধ হয়েছে, নাড়ি স্পন্দন চেপে রাখা হয়েছে এবং হৃৎস্পন্দনগুলো গণনা করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় আমরা কিসের জন্য বসে থাকব?

আমাদের অবশ্যই এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখান থেকে আমরা জিহাদে যুক্ত হতে পারব। যেখান থেকে আমরা মানব জাতির রবের নিকট নিজেদের দোষ মুক্ত করতে পারব। ভূমিগুলোকে ফিরিয়ে আনতে এবং পরিশুদ্ধ করতে - নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব।

যারা এটা মনে করে যে, আফগানিস্তানের জিহাদ - ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা বন্ধ রেখেছে, তারা একটি কল্পনার জগতে বাস করছে। তারা বুঝতে পারছেনা কিভাবে একটি প্রজন্মের নেতারা প্রস্তুত হয়, কিভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, কিভাবে একটি আন্দোলনের কেন্দ্র তৈরি করা হয় - যাতে এর চারপাশে বৃহত্তর মুসলিম সেনাবাহিনী গঠন করা যায়।

এই সেনাবাহিনী পৃথিবীকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করবে। লোকজন আমাদের নিকট আসে এবং বলে যে, আমরা ফিলিস্তিন পরিত্যাগ করেছি এবং নিজেদেরকে আফগানিস্তানে যুক্ত করেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা আফগানিস্তান নিয়ে ব্যস্ত। কারণ আফগানিস্তানের মুজাহিদদের এবং মুসলিমদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

আমরা অবশ্যই আফগানিস্তানের ভূমিকে পবিত্র করব। আফগানিস্তান হল ফিলিস্তিন; ফিলিস্তিন হল আফগানিস্তান। যাইহোক, আমরা চাই না জিহাদের তেজ আমাদের মধ্যে মারা যাক। আমরা এই ধর্মের জন্য প্রবল উত্তাপ চাই এবং নিপীড়িতদের উদ্ধার করতে এবং মুসলিম ভূমিগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে ও নিরাপদ রাখতে প্রবল উৎসাহ চাই। আমরা চাই জিহাদের এই তেজ বেঁচে থাকুক। আর আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদের পথে অটল থাকতে হবে। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইনসহ যেখানেই স্বৈরশাসক, অরাজকতা এবং নিপীড়নের অস্তিত্ব থাকবে সেখানেই জিহাদ একটি জীবনব্যাপী দায়িত্ব।' (ফিল জিহাদ ফিকহ্ ওয়া ইজতিহাদ: ২৪১-২৪৪)

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

আমরা একটি একতাবদ্ধ উম্মাহ এবং একটি যুদ্ধই বিভিন্ন ফ্রন্টে পরিচালনা করছি।

শাইখ খালিদ বাতরাফি হাফিযাহুল্লাহঃ

ফিলিস্তিন ইস্যুটি আন্তরিক এবং অনান্তরিক দুই ভাবেই আলোচনা করা হয়। উভয় পক্ষই এই ইস্যুর জন্য তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে। যাইহোক, প্রকৃত অবস্থা কেবল তখনই বুঝা যায় যখন কথার সাথে কাজের মিল থাকে।

আপনি এমন কোন আন্তরিক ব্যক্তি, দল অথবা সরকার পাবেন না, যারা আফগানিস্তানে, সিরিয়ায়, বার্মায়, তুর্কিস্তানে কিংবা অন্য কোথাও মুসলিমদেরকে ধ্বংস করতে চায়। অন্যদিকে তারা ফিলিস্তিন ইস্যুকে সমর্থন করে এবং ইহুদীদের খপ্পর থেকে আল আকসার মুক্তির জন্য সংগ্রামও করে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

তাওহীদের বিশ্বে আমাদেরকে অবশ্যই একতাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টি খুব ভাল করে অনুধাবন করতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর দরকষাকষির কৌশল এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইন ও মানব রচিত সংবিধানের প্রয়োগ, কেবল বিপর্যয়ের দিকেই নিয়ে যায়। আর সকলের দেখার এবং মনোযোগ দেওয়ার জন্য সেখানে জীবন্ত উদাহরণ রয়েছে। আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে ফিরে আসতে হবে এবং এই উম্মাহকে অস্ত্র এবং সামরিক শক্তির ব্যবহার শিক্ষা দিতে হবে। অপর দিকে সকল দরবারী আলেমদের মুসলিমদেরকে নিরস্ত্র করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

শাইখ আবদুল ইলাহ হাফিযাহুল্লাহঃ

বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি পর্যায়ে মুসলিমদের আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে কুদস পুনরুদ্ধার পর্ব শুরু হবে। আত্মসম্মানের বাহ্যিক নিদর্শনের একটি হল অস্ত্রের অধিকারী হওয়া, যেমনটি ছিল মুসলিমদের গৌরব ও ক্ষমতায়নের যুগে। অস্ত্র হল সম্মানের প্রতীক। যার অস্ত্র নাই, তার সম্মান নাই। যে তার সম্মান হারিয়েছে, সে অন্যের সম্মান রক্ষা করতে পারবে না। মুসলিম ভূমিগুলোর মুক্তির জন্য তার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ সে নিজেই পরাধীন। যে পরাধীন সে আবার কী করে অন্যকে সাহায্য করবে।

আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জায়নিস্ট ক্রুসেডার আধিপত্যের মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক যুদ্ধ হল 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ'। এটিতে আমাদের যুক্ত হওয়া জরুরী। কাফিররা মুসলিম ভূমিগুলোতে তাদের সাহিত্য, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যেসকল মিথ্যা অভিযোগ ও ধারণা ছড়িয়েছে, সেগুলোকে অকার্যকর এবং প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

পশ্চিমা ক্রুসেডাররা কোনো কিছুর খারাপ-ভালো নিজেদের মত করে আকৃতি দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাছে যেটা ভাল মনে হয়েছে সেভাবেই আকৃতি দিয়েছে যাতে বিনয়ী মনগুলোকে এবং পরাজিত আত্মাগুলোকে নিজেদের ইচ্ছা মত তৈরি করে নিতে পারে। এই জায়গা থেকেই আমাদের পরাজয় শুরু।

মুসলমানদের রব কর্তৃক সত্য কিতাব এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহের অনুসরণ ব্যতীত এই পরাজয় থেকে বেরিয়ে আসার আর কোনো রাস্তা তাদের নেই। শুধুমাত্র এই দুটিই হল সত্যের পরিমাপক। সত্য সেটিই যা আল কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মিথ্যা সেটিই, যেটাকে পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ মিথ্যা হিসেবে ঘোষণা করে।

কুরআন এবং সুন্নাহতে যা ভাল হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলোই হল ভাল। আর বাতিল হল সেগুলোই যা কুরআন এবং সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ। ইসলাম হল আলো; যা ইহকালের জন্য আশীর্বাদ এবং পরকালের জন্য সফলতা। এটি চরমপন্থা এবং পশ্চাতপদতা নয়, যা কাফেররা ধারণা করে। জিহাদ হল ইসলামের চূড়া এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করার মাধ্যম।

অসভ্যদের থেকে নেতৃত্ব লাভ করার এবং মানবজাতির সামনে সাক্ষী হওয়ার এটিই একমাত্র রাস্তা। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা এটিকে 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে চিত্রিত করে, আসলে এটি সন্ত্রাসবাদ নয়।

এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করা ধর্মভীরু আলেমদের, আবেদদের এবং সমাজের সভ্য ও শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষদের কর্তব্য। যেন মুসলিমদের হৃদয়গুলো ঘৃণ্য পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

সুতরাং আমরা ক্রুসেডার মিত্রদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অবশ্যই লড়ব এবং জায়নাবাদী জোটের সকল স্তরের বিরুদ্ধেও; যেমন: বিশ্বাস, ধারণা, শিক্ষা এবং রাজনীতি। আমরা অবশ্যই একতাবদ্ধ ও সারিবদ্ধ হব। তারা আমাদের একতাকে বিনষ্ট করার জন্য এবং আমাদের ওয়াদাকে ভঙ্গ করার জন্য জঘন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

মুসলিমদের একতাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা - মূলত একটি অপরাধ। আর এই রকম জঘন্য কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি অবশ্যই একজন অপরাধী। হোক সে বাগদাদী অথবা তার অনুসারীগণ। তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি ছিলেন খলিফা।

যে কেউ মুসলিমদের একতাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে, সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। ক্রুসেড শত্রুরা যা ভয় পায় তা হল - মাগরিব থেকে কাশগড় পর্যন্ত মুজাহিদদের সংহতি, একতা এবং এক-কেন্দ্রাভিমুখিতা। এই জন্যই শত্রুরা তাদের আয়ত্তাধীন সমস্ত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করে। যেমন - যুদ্ধ, বোমা হামলা, ঘুষ, মানব পাচার, প্রতারণা ইত্যাদি।

আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এই ক্রুসেডার অভিযানকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ধারাবাহিক প্রজন্মের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শত্রুকে পরাস্ত করতে সর্বত্রই এটি প্রয়োজন। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত একটি শত্রুকে পরাস্ত করতে ভীষণ অর্থ সম্পদের প্রয়োজন নেই। এই শত্রুকে - উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ধারণা এবং সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেই শেষ করা যেতে পারে। এখানে একটি যুদ্ধ শুরু করাই যথেষ্ট, যেখানে সমগ্র পৃথিবীই হবে যুদ্ধক্ষেত্র।

বর্তমান সময়ে প্রয়োজন - শত্রুদেরকে ক্লান্ত করা। যতক্ষণ না তারা অর্থনীতি ও সামরিক পতনের কারণে গোঙ্গানী ও হাহাকার করবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধের মূল এলাকার বাইরে যেখানে শত্রুরা আমাদের থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হবার আশা করেনা সেখানে আঘাত হানতে হবে। এটা তাদের সীমানার মধ্যে এবং তাদের মাটিতেও হতে পারে। এক্ষেত্রে 'তাল আল সিমন' হল অন্যতম অপারেশনগুলোর একটি। এই অপারেশনটি ছিল শত্রুদের সামরিক অবরোধ ভাঙ্গার একটি বাস্তব উদাহরণ। ছোট–খাটো সমস্যা বাদ দিলে এবং মূল বিষয়ে মনোযোগ দিলে - এই অপারেশনটি সঠিক দিকেই মোড় নিয়েছিল বলা যায়।

এই অপারেশনের শহীদদের আল্লাহ কবুল করুন এবং যারা এই অপারেশনকে সহায়তা করেছিল তাদেরকে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে এবং মুজাহিদদেরকে সিরিয়া ও সর্বত্রই সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে এই সাধারণ যুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করার তাওফিক দান করুন।

শহীদ কারার তাদমুর (Karar Tadmur) ভাইয়ের সংকল্প:

হে বানর এবং শূকরের পুত্ররা!

আমি তোমাদের খুশির সংবাদ দিচ্ছি যে, যতক্ষণ না আমরা তোমাদের আবর্জনা থেকে মাসজিদুল আকসাকে পবিত্র করব, যতক্ষণ না আমরা সকল মুসলিম ভূমি থেকে তোমাদের বিতাড়িত করব - ততক্ষণ আমরা কখনোই ক্লান্ত হব না এবং আশা হারাব না।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

'জেরুজালেম কখনোই ইহুদীদের হবে না' এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল শত্রুদের নিকট একটি স্পষ্ট বার্তা পৌছানো যে - যেহেতু তোমরা জেরুজালেমের চারপাশে তোমাদের অগ্রবর্তী ঘাটি স্থাপন করেছ, সেহেতু তোমাদের এই নির্বুদ্ধিতার চরম মূল্য দিতে হবে।

আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা!

জায়নাবাদী ক্রুসেডার শত্রুরা আমাদের জিহাদকে 'আবদ্ধ জিহাদ' হিসেবে দেখতে চায়। অর্থাৎ তারা জিহাদকে সময় এবং স্থানের সীমাবদ্ধতার নামে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ রাখতে চায়। স্পষ্টভাবে বললে, ফিলিস্তিনে তারা যা অর্জন করেছে, ঠিক এরকম করতে চায়।

পশ্চিম তীর সরাসরি ইসরাইলের বুদ্ধিমত্তার তত্ত্বধানে। গাজা অবরুদ্ধ। প্রতিবারই গাজা প্রতিরোধ গড়ে তুলে, কিন্তু শত্রুরা গণবসতি পূর্ণ অঞ্চলগুলোতে তীব্র বোমাবর্ষণের মাধ্যমে প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেয়।

এইভাবে শত্রুরা ফিলিস্তিনে জিহাদি প্রতিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। শত্রুরা ব্যাপকভাবে যে বিষয়টির উপর নির্ভর করে সেটি হচ্ছে – সময় অতিবাহিত করা।

সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুতেই মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। 'সাময়িক চুক্তি'গুলো একসময় স্থায়ী চুক্তিতে পরিণত হয়। ফিলিস্তিনের বিক্রেতা ও বিশ্বাসঘাতকেরা সময়ের সাথে সাথে 'বড় ভাই', 'মন্ত্রী', মুহাম্মাদ দাহলান, ইবলিসের ভাই বা শয়তানের পুত্রতে রূপান্তরিত হয়।

তাই এই শিকল ভাঙতে হবে এবং এই লড়াইটিকে গাজার সীমানা অতিক্রম করে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। ক্রুসেডাররা যেভাবে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে

আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এখানে একত্রিত হয়েছে, আমরাও তাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে পৃথিবীর সকল স্থানে আঘাত করব।

শাইখ খুবাইব আল সুদানি হাফিযাহুল্লাহঃ

হে মুসলমানরা!

আপনারা কি পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানাদিসহ আপনাদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট?

আপনারা প্রতিদিন টিভিতে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের নৃশংস বর্বরতা, পবিত্র স্থানের পবিত্রতা লঙ্ঘন, পবিত্র স্থান অপবিত্রকরণ, নিরীহদের হত্যা, ঘর ও খামার বাড়িগুলোর ধ্বংস এবং জোরপূর্বক ফিলিস্তিন নাগরিকদের উচ্ছেদ করা দেখতে পাচ্ছেন।

হে মুসলমানরা!

আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অঙ্গীকার থেকে কত দূরে?

কুরাইশদের কাছে পাঠানো এক ব্যক্তির হত্যার গুজবে, ১৪০০ জন সাহাবী প্রাণের স্পন্দন মুহাম্মাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অঙ্গীকার করেছিল মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার। তারা সকলেই নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

আজ বিশ্বাসঘাতক শাসকগুলো ইহুদীদের সাথে মিলে লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য স্বাভাবিকীকরণের চুক্তিকে সফল করতে সহযোগিতা করছে, এখনও কি আপনারা পিছনে বসে থাকাকে পছন্দ করবেন? এই চক্রান্ত শুরু হয়েছিল ক্যাম্প ডেভিডে। এরপর 'অসলো চুক্তি' এবং শেষে 'শতাব্দীর চুক্তি' দ্বারা তারা তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে। তারা আমাদের প্রাণের আকসাকে ইহুদীদের ইবাদত খানা বানাতে চায়।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

অতএব, হে প্রতিবাদী এবং স্বাধীন মুসলিম মুজাহিদ!

পৃথিবীর সর্বত্রই আপনাদের ভাইদের সাথে অংশগ্রহণ করুন। যাতে আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি যে, জেরুজালেম কখনোই ইহুদীদের হবে না ইনশা আল্লাহ।

আমি কি বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন!

শাইখ আবু উবাইদা হাফিযাহুল্লাহঃ

যে সৈন্যবাহিনী মান্দা উপসাগর ঘাঁটিতে অভিযান চালাবে, আমি তাদের নিকট তাওহীদের পতাকা হস্তান্তর করলাম।

শহীদ আহমাদ মুহাজির রহিমাহুল্লাহ:

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় এই পতাকা মান্দা উপসাগর নৌ ঘাঁটি ব্যতীত অন্য কোথাও উড্ডয়ন করা হবে না। আমরা ঘাঁটিটির ভিতরে এই পতাকা উত্তোলন করবই, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বিজয় মঞ্জুর করেন এবং আমাদের শাহাদাতকে কবুল করেন। আমরা এই পতাকা মান্দা উপসাগর নৌ ঘাঁটিতে উত্তোলন করবই, ইনশা আল্লাহ।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহঃ

وآخرُدعوانا أن الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلم. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.

****